দেশের উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি জোগান

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:৪৫
আপডেট: ০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:৫১

বাংলাদেশের বিশাল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সংখ্যাতীত সমস্যা ও সংকটের কারণে স্বাস্থ্য থেকে যোগাযোগ, শিক্ষা থেকে নগরায়ণ–কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের দীর্ঘ, এমনকি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের ক্ষমতার অভাব এবং কয়েক দশক ধরে ঊর্ধ্বগামী দুর্নীতি। গত ১০ বছরে আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে, সত্তর-আশির দশকের তুলনায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের সামর্থ্য বেড়েছে, নিজেদের পয়সায় আমরা পদ্মা সেতু তৈরি করতে পারি, কিন্তু দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা দূরের কথা, আমাদের হাত থেকেই তা ফসকে গেছে। এখন বড় বড় পরিকল্পনা হয়, কিন্তু বাস্তবায়িত হয় না, হলেও কাজ শেষ হয় না। দফায় দফায় খরচ বাড়ে, নানা ব্যক্তির পকেট ভারী হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেক পরিকল্পনা হয়েছে, একটি শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছে, ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে সেটি গৃহীতও হয়েছে, কিন্তু এটি এখন চলে গেছে হিমাগারে। বছর দুয়েক আগে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে ১৩ বছর মেয়াদি একটি কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সেটিও বাস্তবায়নের অনিশ্চিত অপেক্ষায়। অথচ দুই ধারায় বিভক্ত আমাদের উচ্চশিক্ষা এগুলো থেকে অনেক উপকৃত হতে পারত।

উচ্চশিক্ষার প্রথম এবং মূল ধারাটি হচ্ছে ‘গণ’ বা পাবলিক (অর্থাৎ যার অর্থায়ন হয় জনগণের পয়সায়) এবং দ্বিতীয় ধারাটি বেসরকারি বা প্রাইভেট, যার পেছনে বিনিয়োগ করেন বেসরকারি উদ্যোক্তারা এবং কাগজে-কলমে সেই বিনিয়োগ হওয়ার কথা অলাভজনক। কিন্তু সমস্যা হলো, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই এই অলাভজনক বিষয়টি এমনই লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে মঞ্জুরি কমিশনে যেকোনো মুহূর্তে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক ডজনের বেশি আবেদন জমা হয়ে থাকে। বিনিয়োগ থেকে নানা উপায়ে লাভ উদ্যোক্তাদের হাতে চলে যাওয়ার কারণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রাধান্য পায় বাজারবান্ধব কিছু বিষয়, যেমন বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রশাসন, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক প্রকৌশল ইত্যাদি। তবে সমস্যায় যাওয়ার আগে যেসব সম্ভাবনা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি করেছিল, সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

স্বাধীনতার পর উচ্চশিক্ষায় একটা সংকট দেখা দেয়। একটি নতুন দেশের প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়, কিন্তু মাত্র চার-পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। আশির দশকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার্থীরা যেতে শুরু করে। একমাত্র ভারতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজারে। প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিদেশে যাওয়ায় আমরা বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা হারাই। অথচ বিদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানেই যে উন্নত শিক্ষা দানকারী প্রতিষ্ঠান, তা তো নয়। ১৯৯০-এর শুরু থেকে এই চাহিদাকে মাথায় রেখেই বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। বিদেশমুখী শিক্ষার্থীদের দেশে রেখে শিক্ষা দেওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রা দেশের তহবিলে রাখার বিষয়টি ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় একটি অবদান।

শুরুর দিকের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠদান ছিল উন্নত মানের। এখনো অন্তত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান থেকে উন্নত মানের। তাদের গ্রন্থাগারগুলোও সমৃদ্ধ, পাশাপাশি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় বড় অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা, নানান ক্লাবের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পাঠবহির্ভূত নানা কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও এরা এগিয়ে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তারা কিছু মানদণ্ড মেনে চলে, যেমন পিএইচডি গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে, যা মেধাবী শিক্ষার্থীদের সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে উৎসাহী করে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ক্ষেত্রেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে। আমাদের এ বিষয় মনে রাখতে হবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীসংখ্যা ৪০ থেকে ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা থেকে বেশি (অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসংখ্যা যোগ হলে এখনো চিত্রটি পাল্টে যায়)। আমার ধারণা, যেভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে একদিন এদের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তত সংখ্যার বিচারে এগিয়ে যাবে। তবে যে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমি বললাম, যাদের

বাংলা ট্রিবিউন ও ঢাকা ট্রিবিউন নামে ঢাকার দুটি পত্রিকা এবং একটি গবেষণা সংস্থা পরিচালিত জরিপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা তাদের শিক্ষার্থীদের ভালো মানের শিক্ষাই দিচ্ছে। তবে তাদের শিক্ষার্থীসংখ্যা বড় ধরনের বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্তি রয়েছে, শিক্ষার্থী আদান-প্রদানের সুযোগও রয়েছে। তা ছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা বিদেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে এবং চিন্তা বিনিময় করতে পারেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলোতে গ্র্যাজুয়েট হতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়, তাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠনও সক্রিয়। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বেতন মওকুফ বা হ্রাসের বা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এসব হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিবাচক দিক।

কিন্তু উল্টো পিঠে অনেক সমস্যাও রয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান সম্প্রতি জানিয়েছেন, এ মুহূর্তে ১৬৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং এই লেখা প্রকাশিত হতে হতে হয়তো আরও দু-একটি অনুমোদনের পথে থাকবে। এই বিশাল সংখ্যার বেশির ভাগই উন্নত কোচিং সেন্টার ছাড়া আর কিছু নয়। শহরের নানা জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো ‘ক্যাম্পাস’ভিত্তিক–যা উঁচু কিছু দালানমাত্র, যেখানে পরিসরের প্রচণ্ড অভাব–এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে না আছে শিক্ষার পরিবেশ, না খেলাধুলা বা চিত্তবিনোদনের কোনো উপায়। এগুলোয় গ্রন্থাগার ক্ষুদ্রায়তনের, বিজ্ঞানাগার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কাগজে-কলমে তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস হয়তো আছে, কিন্তু সেগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও সেসব শহর থেকে এত দূরে যে পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস হওয়ার সম্ভাবনা সেগুলোর ক্ষীণ এবং সময়সাপেক্ষ; অথচ বড় ও ভালো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় চমৎকার স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরি করেছে, যেখানে খেলার মাঠ আছে, পরিসর আছে, স্থপতি-নকশায় তৈরি দালান আছে। যেদিন প্রতিটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সেই অবস্থানে যাবে, সেদিন বলা যাবে, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সেদিন এই শতাব্দীর কবে হবে, তা অনুমান করাটাও কঠিন।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় একটি ‘সমাজ’ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। এমনও বলা যায়, সমাজ প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা অর্জন অদূর ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে অসম্ভব। এই সমাজে মেলামেশা করবেন শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যরা। সেখানে সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ হবে, সম্পর্ক হবে, চিন্তার আদান-প্রদান হবে। এই সমাজ হবে বিদ্বৎ-সমাজ, যা দেশ নিয়ে ভাববে, শিক্ষার আদর্শ চর্চা করবে, যা নতুন জ্ঞান তৈরি ও বিতরণ করবে। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সেই সমাজ আছে, তা বলা যাবে না, তবে সেসব তৈরির অনুকূল পরিবেশ আছে, সম্ভাবনা অন্তত আছে। এই সমাজের অভাবে শিক্ষা অপূর্ণ থাকে।

যেভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে একদিন এ শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তত সংখ্যার বিচারে এগিয়ে যাবেন। ছবি: খালেদ সরকার

শিক্ষা বা বিদ্বৎ-সমাজের অভাব থেকে যাবে, যত দিন শিক্ষাকে বাণিজ্যিক একটি মাত্রা দেওয়া হবে। বেশির ভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সনদমুখী এবং বাজারমুখী শিক্ষা দিয়ে থাকে। চার মাস মেয়াদি ‘সেমিস্টার’ পদ্ধতির কারণে পাঠক্রম থাকে সীমিত। খণ্ডিত জ্ঞান নিয়ে যাঁরা বের হন, তাঁদের বেশির ভাগ ওই বাজারের জন্যই উপযুক্ত হতে পারেন না। তা ছাড়া বাজার তো আর স্থির নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, এটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, প্রতিযোগিতানির্ভর, ডারউইনীয় একটি বাস্তবতা, যা সময়-সময় নিজের ক্রিয়াকলাপের নিয়ম এবং এতে প্রবেশের শর্ত বদলায়। এই বাজারে ঢুকতে গেলে এখন শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং ইংরেজিতে পারদর্শী হলে চলবে না, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং বৈশ্বিক বাজার সম্পর্কে দক্ষ হতে হবে। এসব যোগ্যতার অভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা দেশের ভেতরেই সুপার ম্যানেজার হতে পারেন না, যে অবস্থানটি দখল করে নিয়েছেন ভারতীয়, কোরীয় ও অন্যান্য দেশের ব্যবস্থাপকেরা। প্রতিবছর তারা ছয় বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। অথচ এই অর্থ উপার্জন করতে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য জায়গায় আমাদের কয়েক লাখ অদক্ষ শ্রমিককে ছয় মাস অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়।

উচ্চশিক্ষার অন্তত ছয়টি সূচকে উন্নতি না ঘটাতে পারলে তা পরিপূর্ণ ও কার্যকর হয় না। এই সূচকগুলো হচ্ছে দূরদৃষ্টি এবং কর্মপরিকল্পনা, প্রশাসন, শিক্ষা ও গবেষণা, গুণগত মান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং এই সময়ে এসে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এসব সূচক অর্জনে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান অনেক মানবিক। আমি আগেই বলেছি, খুব কমসংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবসাই হচ্ছে প্রধান চিন্তা। এটি করতে গিয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যাদের সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। কাগজে-কলমে দূরদৃষ্টি এবং কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লেখা থাকলেও বাস্তবে এগুলোর কোনো প্রতিফলন নেই। প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ট্রাস্টি বোর্ড। উপাচার্যের স্থান ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নিচে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতা উপাচার্যের নেই। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের অফিসকক্ষ আয়তনে উপাচার্যের অফিসকক্ষের দুই-তিন গুণ বড় এবং চেয়ারম্যানের আগমন ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়া পড়ে যায়। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সবাই কোমর বেঁধে নেমে যায়।

একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে এমন কর্তৃত্ব ফলাতে কেন উৎসাহী এই বিনিয়োগকারীরা?

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই চিত্রের বিপরীতে ভালো চর্চা আছে, সেগুলো কেন আদর্শ হয় না? ভালো চর্চাটি অবশ্য আছে হাতে গোনা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সনদ হস্তান্তরের জায়গা নয়, এখানে গবেষণা ও জীবনমুখী পঠনপাঠনের নতুন নতুন উদ্ভাবনের পর্যাপ্ত সুযোগ ও প্রণোদনা থাকা উচিত। বেশির ভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো মানের কোনো গবেষণা হয় না–শিক্ষকেরা শুধু কিছু একাডেমিক প্রবন্ধ নিয়ে ছাপান, কিন্তু দিনের শেষে এগুলো কিছু রুটিন একাডেমিক কার্যক্রমের বাইরে আর কিছুই নয়। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও অরাজকতা দেখা যায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষকতায় নিয়োগ দিয়ে এরা ভালো শিক্ষকের অভাব পূরণের চেষ্টা করে। কিন্তু এতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসব শিক্ষকের সম্পর্কটি মৌসুমিই থেকে যায়। অথচ শিক্ষকতার একটি বড় শর্ত হলো শিক্ষার্থীদের উপদেশ-পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া। এমনকি ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা নিয়েও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে যেতে পারেন। তাঁদের জন্য খণ্ডকালীন শিক্ষকেরা সময় দিতে পারেন না। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের–বিশেষ করে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ে–চারটি বা তার বেশি কোর্স নিতে হয়। শিক্ষকতার ভারে তাঁরা বিপর্যস্ত থাকেন। তাঁদের পক্ষে নিজস্ব গবেষণা করার সুযোগে একটা বড় ঘাটতি থেকে যায়।

বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান উন্নয়ন (এইচইকিউইপি) শীর্ষক একটি কার্যক্রম বেশ কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে। গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু উদ্যোগ ছাড়া এই কার্যক্রমে মানোন্নয়নের অনেক বিষয় অবহেলিত রয়ে গেছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা এখনো করা হয়নি, তরুণ শিক্ষকদের গবেষণা পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও অপর্যাপ্ত। এসব কারণে শিক্ষাদানে কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন থেকে অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে আছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও অসচ্ছলতা বিরাজমান। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের থেকে উচ্চ হারে বেতন আদায় করে, কিন্তু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের আয়-ব্যয়ের চিত্র কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের গোচরে থাকে না। এসব কারণে উপার্জিত টাকা থেকে ব্যয় বাদ দিলে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তার হিসাব ট্রাস্টি বোর্ড ছাড়া কারও জানা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া মাঝেমধ্যে যে বেতন বৃদ্ধি হয়, তার পেছনের যুক্তিগুলো স্পষ্ট করে দেখানো হয় না। আর্থিক ক্ষেত্রে বোধ করি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বচ্ছতার অভাব সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের শিক্ষা বাস্তবতায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থাকার জন্যই এসেছে। শুধু যে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় তা নয়, এখন অনেক বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হবে (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে)। এদের নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার ১৯৯২ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে, কিন্তু এক দশকের ব্যবধানে এদের সংখ্যা ৫০ অতিক্রম করলে সরকার নতুন করে একটি আইন তৈরির উদ্যোগ নেয়। সাত বছর প্রচেষ্টার পর ২০১০ সালের ১৮ জুলাই সেটি জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় এবং এর অধীনেই এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড চলার কথা। আইনে বলা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি করবে। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশনের যে জনবল, তাদের ১৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এর পক্ষে একটি অসম্ভব ব্যাপার। উচ্চশিক্ষা কৌশল পরিকল্পনা ২০১৮-৩০-তে সুনির্দিষ্টভাবে মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে উন্নীত করার এবং প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এর বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ২০১০ সালের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের ধারাগুলো যদি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌক্তিকায়ন, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি এদের শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নীত হবে। তবে গত এক দশকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় ওই আইনেও কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে, যেমন আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শিক্ষার্থী ফি, বেতনকাঠামো ও চাকরি প্রবিধানমালা, সাধারণ তহবিল, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ) এবং জবাবদিহির ক্ষেত্রে (এর বাইরে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও দৃষ্টি দিতে হবে)। এসব করা গেলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাচিত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটবে।

আজকাল ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ বলে যে কথাটি প্রায়ই শোনা যায়, অর্থাৎ একটি দেশের জনসংখ্যায় বয়সচিত্রের তারতম্য—যা জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাসের ফলে ঘটে থাকে—যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জোগান দেয়, তার সঠিক ব্যবস্থাপনা অনেক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। এই সম্ভাবনাগুলো তৈরি করে শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে যত উন্নতি হবে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড তত বৃদ্ধি পাবে। পাবলিক-প্রাইভেট বিভাজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো না ফেলে উভয়

ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টায় আমাদের নেমে পড়তে হবে। সরকারের কাছে কৌশলপত্র ও কৌশল পরিকল্পনার অভাব নেই, অভাব সক্রিয়তার। কিন্তু সক্রিয়তা দেখাতে যত দেরি হবে, তত আমরা পিছিয়ে পড়ব।

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক